আমাদেরসময়

তারিখ 21 FEB 2016
পৃঃ 8 কলাম 3

মাতৃভাষার আন্তর্জাতিক সম্মানের সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তে

ড. সা'দত হুসাইন

সর্বোচ্চ অঙ্গীকার ও নিরলস সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের মাতৃভাষাকে রক্ষা করেছি, স্বাধীনতা অর্জন করেছি এবং সর্বশেষে আমরা আমাদের মাতৃভাষা ও তার জন্য যে আত্মোৎসর্গ, তার স্বীকৃতি পেয়েছি। মনে হচ্ছে আমরা পরবর্তী সহস্রাব্দটি দৃঢ়তার সঙ্গে এবং আরও বেশি প্রত্যাশাকে পুঁজি করে বেঁচে থাকার অধিকার অর্জন করেছি

দিনটি ছিল ১২ নভেম্বর। ১৯৯৯। ইউনেস্কোর ৩০তম সাধারণ সম্মেলনের কমিশন-২ এর অধিবেশন চলছিল। অল্প সময়ের মধ্যেই একুশে ফেব্রুয়ারি দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালনের প্রস্তাব উত্থাপিত হবে। আগের দিনই প্রস্তাবটি উত্থাপনের কথা ছিল কিন্তু সময়ের স্বল্পতার কারণে তা সম্ভব হয়নি। সম্মেলনে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলে আমরা যারা ছিলাম, প্রস্তাবের পরিণতি কী হতে পারে তা নিয়ে আমরা সবাই ছিলাম উত্তেজিত ও উদ্বিগ্ন। বেশ কিছুদিন ধরে এ নিয়ে জোরালো লবিং চলে আসছিল। শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক ছিলেন এর নেতৃত্বে। প্রতিনিধি দলের প্রধান হিসেবে তিনি তার বক্তৃতায় একুশে ফেব্রুয়ারি দিনটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছিলেন এবং দিবসটিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' ঘোষণা করার জন্য অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিদের কাছে আবেদন জানাচ্ছিলেন। কমনওয়েলথের সদস্য দেশগুলোর সমর্থন আদায়ের জন্য প্যারিসের বাংলাদেশ দূতাবাসও কঠোর পরিশ্রম করছিল। ফলে পাকিস্তানসহ ২৮টি দেশ বাংলাদেশের প্রতি আনুষ্ঠানিক সমর্থন দিতে সম্মত হয়। প্রায় দশ দিন প্যারিসে অবস্থান করে শিক্ষামন্ত্রী দেশে ফিরে আসেন। পরে প্রতিনিধি দলের উপ-প্রধান হিসেবে আমার পালা আসে সেখানে দলের সঙ্গে যোগ দেওয়ার। প্যারিস সম্মেলনে যোগদানের প্রাক্কালে মন্ত্রী প্রস্তাবটি সম্পর্কে আমাকে ব্রিফ করেন এবং কিছু কিছু মহল থেকে বাড়তি অর্থনৈতিক বোঝা চাপার অজুহাত দেখিয়ে প্রস্তাবটির বিরোধিতা আসা সত্ত্বেও তিনি যথেষ্ট আশাবাদী ছিলেন, প্রস্তাবটি সম্মেলনে গৃহীত হবে। পরে ঢাকায় বসেও তিনি নিয়মিত এর কতদূর কী হলো, তার বিষয়ে খোঁজখবর রেখেছেন।

কমিশন-২ এর অধিবেশনে প্রস্তাবটি পেশ করার নির্ধারিত সময়ের কয়েক মিনিট আগে আমাকে প্লেনারিতে যেতে হয় ইউনেস্কোর মহাসচিব নির্বাচনে ভোট দেওয়ার জন্য। ফ্রান্সে আমাদের রাষ্ট্রদূত এবং ইউনেস্কোতে স্থায়ী প্রতিনিধি সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল প্রস্তাবটি কমিশনে উপস্থাপনের। আমি খুব চিন্তিত ছিলাম যে, প্রস্তাবটি উত্থাপনের এ রকম একটি মুহূর্তে আমি হয়তো উপস্থিত থাকতে পারব না। কিন্তু ভাগ্য আমার প্রতি সুপ্রসন্ন ছিল। তাই অন্যান্য প্রস্তাব নিয়ে বিতর্ক দীর্ঘায়িত হওয়ায় আমাদের প্রস্তাবটির উত্থাপন কিছুটা বিলম্বিত হয়। ফলে সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলী প্রস্তাবটি কমিশন-২ এর সামনে উত্থাপনের আগেই আমি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে যোগ দিই। প্রতিনিধি দলে আমি ছাড়া অন্যান্যের মধ্যে ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক সাইদুর রহমান, বাংলাদেশের ইউনেস্কো জাতীয় কাউন্সিলের সচিব অধ্যাপক কফিল উদ্দিন আহমদ ও ফ্রান্সে বাংলাদেশ দূতাবাসের কাউন্সিলর ইকতিয়ার চৌধুরী।

এছাড়া ইউনেস্কো মহাপরিচালকের বিশেষ উপদেষ্টা টনি (তোজাম্মেল) হকও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। রাষ্ট্রদূত মোয়াজ্জেম আলী তার কাজটি ঠিকমতোই করছিলেন। আমাদের সঙ্গে ব্যাপক শলাপরামর্শের মাধ্যমেই তিনি তার বিবৃতিটি তৈরি করেছিলেন। বিবৃতিতে তিনি যোগাযোগের কার্যকর মাধ্যম হিসেবে এবং নিজেকে ব্যক্ত করার উপায় হিসেবে মাতৃভাষার গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করেন। তিনি লেখেন, ভাষা সমাজের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মর্মমূলে প্রোথিত। মাতৃভাষায় কথা বলা ও লিখতে পারার অধিকার এক অবিচ্ছেদ্য অধিকার, যা আমাদের জীবনকে সমৃদ্ধ করতে এবং শান্তির সংস্কৃতিকে জাগ্রত করতেই সংরক্ষণ করা একান্ত প্রয়োজন। পৃথিবীর অনেক ভাষা হারিয়ে গেছে এবং অনেক ভাষার অস্তিত্বও আজ হুমকির মুখে। কাজেই আমরা যদি মাতৃভাষার গুরুত্বকে স্বীকৃতি না দিই, তাহলে জনগণের মতপ্রকাশের অধিকার বাস্তবায়িত হবে না এবং মানবসম্পদ উন্নয়নের সম্ভাবনাও হারিয়ে যাবে। বিশ্বের বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায় তাদের মাতৃভাষা রক্ষায় সংগ্রাম করেছে, তবে মাতৃভাষার জন্য বাংলাদেশের সাহসী ছেলেদের জীবনদান ও সাফল্য এ ক্ষেত্রে আলাদা মর্যাদার দাবি রাখে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশ) ভাষা আন্দোলনে শহীদরা ঢাকার রাজপথে নিরাপত্তা বাহিনীর বুলেটে বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দেয়। বিশ্বের ভাষা ও যোগাযোগের ইতিহাসে এ ঘটনা বিশেষ স্বীকৃতির দাবি রাখে। তাই জীবনের বিনিময়ে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি যারা মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষারূপে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মাতৃভাষাকে রক্ষা করে গেল, তাদের সে আত্মত্যাগকে স্মরণীয় করে রাখতে সারা বিশ্বে দিনটিকে যৌক্তিক কারণেই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করা উচিত। বাংলাদেশের প্রতিনিধি দল সদস্য দেশগুলোর কাছে যোগাযোগের মাধ্যম ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে মাতৃভাষার প্রতি যথাযথ মর্যাদা জ্ঞাপন করার পথ

হিসেবে এ প্রস্তাবের প্রতি তাদের সমর্থন জানানোর অনুরোধ জানায়। প্রস্তাবে এ-ও বলা হয় যে, প্রতিটি দেশ যেহেতু নিজের মতো করে দিবসটি পালন করতে পারবে, কাজেই এ জন্য অতিরিক্ত ব্যয়ের কোনো প্রয়োজন হবে না। সদস্য দেশগুলোর প্রতিনিধিরা বাংলাদেশের প্রস্তাব মেনে নেন। একজনও এর বিরোধিতা করেননি, এমনকি কেউ কোনো সংশোধনীও আনেননি। ফলে কমিশনে প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এরপর বাকি থাকে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য তা সম্মেলনের প্লেনারিতে পেশ করার। ততক্ষণে আমরা জেনে ফেলেছি, প্রধান বাধাটি আমরা অতিক্রম করে ফেলেছি। প্লেনারিতে পেশ করা আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। যা হোক প্লেনারি অনুষ্ঠানের জন্য আমাদের ১৭ নভেম্বর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হলো। ইতোমধ্যে আমরা কমিশন-২ এর খসড়া রেজুলেশনটি যথাযথভাবে লেখা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করে নিলাম। অন্যদিকে ঢাকায় শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে সার্বক্ষণিকভাবে যোগাযোগ রক্ষা করে তার পরামর্শ নিচ্ছিলাম। প্রস্তাবের কোনো শব্দ বা বাক্যে ভুল হলো কিনা সে ব্যাপারে জানার জন্য কমনওয়েলথ মহাপরিচালকের কার্যালয় ও সচিবালয়ের মধ্যে জোর লিয়াজোঁ রক্ষা করছিলেন টনি হক। শেষ মুহূর্তেও যাতে কোনো প্রকার ঝামেলা না দেখা দেয়, সে জন্য সব ধরনের পূর্বসতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছিল। সর্বশেষ এলো ১৭ নভেম্বর '৯৯। আমাদের বহু কাঙ্ক্ষিত সেই চূড়ান্ত মুহূর্তটি। কমিশন-২ এর চেয়ারম্যান বিভিন্ন খসড়া প্রস্তাবসহ তার রিপোর্ট উপস্থাপন করলেন সাধারণ সম্মেলনে পাস করানোর জন্য। খুব কম সময় আলোচনা চলল এবং সর্বসম্মতিক্রমে সবগুলো প্রস্তাব পাস হয়ে গেল। ইউনেস্কো সাধারণ সম্মেলনের ৩০সি/ডিআর ৩৫ প্রস্তাবে লেখা হলো– '২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসরূপে পালনের ব্যাপারে সাধারণ অধিবেশনের ঘোষণা এখন থেকে ইউনেস্কোর সাধারণ অধিবেশনের আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত বলে গণ্য হলো।' সঙ্গে সঙ্গেই সংবাদ পাঠিয়ে দেওয়া হলো দেশে। শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক তাৎক্ষণিকভাবে এক সংবাদ সম্মেলন ডেকে সংবাদপত্রগুলোকে সুখবরটি জানিয়ে দিলেন। আমরা প্রতিনিধি দলের সদস্যরা ইউনেস্কো সদর দফতরের কাছে ক্যাথি রয়্যাল রেস্তোরাঁয় মধ্যাহ্নভোজ খেয়ে সেলিব্রেট করলাম। টনি হক আমাদের সঙ্গে ছিলেন। এটা ছিল একটা ঐতিহাসিক মুহূর্ত। এমন একটি ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত থাকতে পেরে আমি ছিলাম উচ্ছ্বসিত। এ ধরনের কোনো ঘটনায় অংশ নিতে পারলে যে কেউই নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করবে। যা হোক এবার একটু পেছনে ফিরে যাই। বাংলা ভাষাকে আন্তর্জাতিক মর্যাদাদানের এই ঐতিহাসিক ও অনন্যসাধারণ প্রক্রিয়াটি সূচনা করেছিলেন কানাডা প্রবাসী বাংলাদেশিরা। বাংলাদেশ ডেলিগেশন সেটি ইউনেস্কোর ৩০তম সম্মেলনে উত্থাপন করে এবং সাফল্য পায়। কানাডা প্রবাসী বাংলাদেশিদের এ উদ্যোগের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন রফিকুল ইসলাম, যার নাম এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। এ রকম একটি ঐতিহাসিক মুহূর্তে আমি খানিকটা আনমনা হয়ে উঠি। স্মৃতিতে ভেসে ওঠে ১৯৫২ সাল ও তার পরবর্তী সময়ের কথা। একটি জেলা শহরে তখন আমি দ্বিতীয় গ্রেডের ছাত্র। আমি বুঝতাম না মাতৃভাষা কী, আর এর গুরুত্বই বা কী। যেটুকু মনে আছে তা হচ্ছে, ঢাকায় কয়েকজনকে মেরে ফেলা হয়েছে এবং চারদিকে তাই নিয়ে কথাবার্তা চলছে। এ সময় আমাদের স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হয়। আমাদের ওপরের শ্রেণির ছাত্রদের বাংলা ভাষার পক্ষে স্লোগান দিতে শুনেছি, যা আমি খুব কমই হৃদয়ঙ্গম করতে পারতাম। ১৯৬২ সালে আমি যখন ঢাকা কলেজের ছাত্র, তখন ছাত্র রাজনীতির প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠি। তখন শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের বিরুদ্ধে দেশে তোলপাড় চলছিল। আমরা রিপোর্টের বিরোধিতা করে ঢাকার রাস্তায় বিক্ষোভ করেছি, ফলে সরকার তা বাতিল করতে বাধ্য হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর আমি ছাত্র রাজনীতির একজন কর্মী হয়ে যাই। তখনই ভাষা দিবসের গুরুত্ব আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়। আমি বুঝতে পারি, মাতৃভাষা রক্ষায় একুশের শহীদরা কীভাবে নিজেদের উৎসর্গ করেছিলেন। তখন থেকেই গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে আমি দিবসটি পালন করে আসছি। কখনো বন্ধুদের সঙ্গে, কখনো সতীর্থদের সঙ্গে, কখনো ব্যক্তিগতভাবে। বড় হয়ে আমি উপলব্ধি করলাম, একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এর মধ্য দিয়ে আমাদের অস্তিত্ব সংরক্ষিত হয়েছে। সব গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় আন্দোলনে একুশে ফেব্রুয়ারি হয়ে উঠেছে আমাদের আশা ও উদ্দীপনার প্রদীপ। পরবর্তী সময়ে সব ধরনের অত্যাচার, অবিচার, বৈষম্য ইত্যাদির বিরুদ্ধে সংগ্রামে উদ্দীপনা ও আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছে এ ভাষা আন্দোলন। একুশে ফেব্রুয়ারির চেতনা এখন মাতৃভাষার পরিধি অতিক্রম করে সব পর্যায়ে মানবাধিকার বাস্তবায়ন করার একটি শক্তিশালী মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। মাতৃভাষা আন্দোলনের এ চেতনা থেকেই আমরা যে কোনো অবিচার ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার উদ্দীপনা পেয়েছি। এছাড়া কোনো বৈধ দাবি আদায়ের লক্ষ্যে সাধারণ মানুষ যখন সংগ্রাম করে তখন তাদের মনোবল হিসেবে কাজ করে এ ভাষা আন্দোলনের চেতনা। প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারিতে বাঙালিরা গভীরভাবে এর তাৎপর্য অনুভব করে এবং আবেগঘন দৃঢ়তায় দিবসটি পালন করে। তারা তাদের অস্তিত্বের নতুন অর্থ খুঁজে পায় এবং এক বছর পর আরও কেটি একুশে ফেব্রুয়ারি আসার প্রতীক্ষা করে। এটাই হচ্ছে মাতৃভাষার শক্তি।

বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। এর আগে দিবসটির সম্মানে একমাত্র সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল তা হচ্ছে এটিকে 'শহীদ দিবস' হিসেবে জনপ্রিয় করে তোলা। দিবসটিকে আরও বিশেষ কোনো মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন ছিল। সে লক্ষ্যেই ছিল আমাদের প্রচেষ্টা। আমাদের সবার মিলিত প্রয়াসকে ধন্যবাদ যে, বিশ্ব এখন আমাদের মাতৃভাষা রক্ষা তথা মৌলিক মানবাধিকার রক্ষার সংগ্রামকে স্বীকৃতি দিয়েছে। আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতির জন্য প্রাণ দিয়েছেন সালাম, জব্বার, রফিক, বরকত। এভাবে তারা এখন হয়ে গেছেন আমাদের জীবনের অংশ আর দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে আমরা হয়েছি ইতিহাসের অংশ। আমাদের প্রজন্ম এ নিয়ে গর্ব করতে পারে।

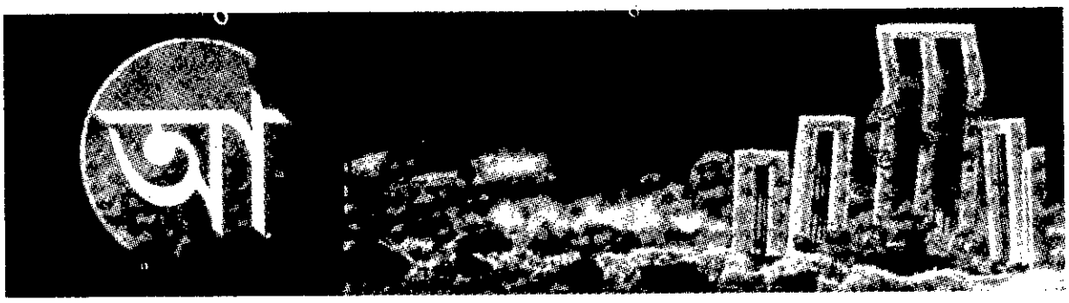

বিদায়ী সহস্রাব্দ শেষ হওয়ার আগেই আমাদের মাতৃভাষার দাবিতে আত্মাহুতিদানকারী শহীদদের মিলেছে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। অবশ্য এর আগে এমন অনেক আত্মত্যাগের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি মিলেছে। কারণ সেগুলো ছিল উন্নত দেশগুলোর ঘটনা। আর মাতৃভাষার জন্য আমাদের সংগ্রাম ও ত্যাগের স্বীকৃতি মিলতে মিলতে পার হয়ে গেল ৪৭ বছরেরও বেশি সময়। যা হোক তবুও আমরা তো পেয়েছি। সর্বোচ্চ অঙ্গীকার ও নিরলস সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের মাতৃভাষাকে রক্ষা করেছি, স্বাধীনতা অর্জন করেছি এবং সর্বশেষে আমরা আমাদের মাতৃভাষা ও তার জন্য যে আত্মোৎসর্গ, তার স্বীকৃতি পেয়েছি। মনে হচ্ছে আমরা পরবর্তী সহস্রাব্দটি দৃঢ়তার সঙ্গে এবং আরও বেশি প্রত্যাশাকে পুঁজি করে বেঁচে থাকার অধিকার অর্জন করেছি।

(রচনাকাল : ১৯৯৯)

লেখক : সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব ও পিএসসির সাবেক চেয়ারম্যান